কুমারসম্ভবের কবি ও তাঁর আরাধ্য দেবতা

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

''মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দিরপ্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস—''

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে মহেশের আপন কবি বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর কবিতায়, সংস্কৃত সাহিত্যের সেই অনন্যসাধারণ কবি কালিদাসের রচনায় যে শিববন্দনা থাকবেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচনা বিচিত্রগামী। মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশীয়—প্রত্যেকটি কাব্য-নাটক বিষয়বস্তু ও ভাবনার দিক দিয়ে আলাদা, তবুও যখনই কবি কোনও বিষয়ের সূত্র ধরে অথবা নাটকের নান্দীশ্লোকে মহাদেবের বর্ণনা করেছেন, তখনই সেটি তার কাব্যময়তাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতাকে প্রকাশ করেছে। এই প্রবন্ধে কালিদাসের কলমে শিববন্দনার একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মেঘদূতম্' অন্যতম। সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে ছন্দ-ভাব-কথার মেলবন্ধনে রচিত এমন এক অনুপম কাব্য চিরন্তন সম্পদ। বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠাচ্ছে অলকায় তার প্রিয়ার কাছে; এ-কাব্যের প্রথমাংশে তার যাত্রাপথের বর্ণনা। যক্ষের অন্তর্বেদনা নিয়ে রচিত এই মাধুর্যময় কাব্যে কবি কখন যে সকলের অগোচরে তাঁর অন্তরের ভক্তিরসের স্রোতস্বিনীকে স্বতোৎসারিত কাব্যনির্ঝরিণীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, পাঠক কাব্যরস আস্বাদনের সময় সেটি পৃথক করে বুঝতে পারেন না। যদি মেঘদূতের শিববন্দনাকারী ওই শ্লোকগুলিকে আলাদা করে আলোচনা করা হয় তাহলে মনে হবে শিব ও সুন্দর কবির হৃদয়ে একীভূত হয়ে গেছে।

কবি যক্ষকে দিয়ে মেঘকে বলিয়েছেন :

''ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়স্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতি-স্নান-তিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ॥''

—উজ্জয়িনীতে চণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির, সেখানে তুমি যেয়ো। আর মহাকালের মন্দিরে গিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা কোরো। সন্ধ্যাকালে যখন আরতি আরম্ভ হবে, ঢাক বাজানোর প্রয়োজন হবে, তখন তুমি গম্ভীরস্বরে গর্জন কোরো। তোমার সেই গর্জনেই ঢাকের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে আর তুমিও দেবসেবার ফল লাভ করবে।

কী অপূর্ব ভাবনা!! সঙ্গে ভাবের ব্যঞ্জনা। অপ্রাকৃত বস্তুকে দিয়ে কবি দেবাদিদেবের পূজা করিয়ে নিচ্ছেন। এই সমগ্র বিশ্বের সবকিছুই

ঈশ্বরের সেবায় রত, সবাই সেই একই বিরাটের পূজা করছে।

আবার কবি বলছেন,

''পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥''

—ত্রিলোচনের যখন নৃত্য করতে ইচ্ছা হবে, তখন তুমি অস্তসূর্যরাগ গায়ে মেখে তাঁর সিক্ত রক্তবিন্দুবর্ষী নাগচর্মের আগ্রহ নিবারণ কোরো, অর্থাৎ তিনি যেন তোমাকেই তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত নাগচর্ম ভেবে নেন। এই দৃশ্য দেখে ভবানী তোমার শিবভক্তিতে সন্তুষ্ট হবেন।

কী অসাধারণ দৃশ্যকাব্য! ছবির পর ছবি সাজিয়ে কাব্য হয়তো অনেকেই রচনা করতে পারেন, কিন্তু অন্তরের দেবতার রূপটি এমনভাবে কে কবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন!

মেঘের গন্তব্য অলকা। উজ্জয়িনী পেরিয়ে সে এসে পৌঁছেছে কৈলাসে। কৈলাসের আর-এক অপার্থিব রূপ বর্ণনা করছেন কবি—

''গত্বা চোর্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থ-সন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশ-বনিতা-দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদ-বিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশিভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥''

—তুমি হবে কৈলাস পর্বতের অতিথি—যার তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি এত স্বচ্ছ যেন মনে হয় দর্পণ—সুরসুন্দরীরা ওই দর্পণেই প্রসাধন করেন। কৈলাসের সানুদেশ শিথিল হয়ে গেছে রাবণের বাহুর আলোড়নে। আকাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে কৈলাসের অজস্র শৃঙ্গ, কুমুদের মতো শ্বেতবর্ণ তুষারে আচ্ছন্ন। দেখলে মনে হবে, এ যেন পাথর নয়, যুগযুগান্ত ধরে মহাদেবের অট্টহাসি জমে জমে কৈলাস পর্বত তৈরি হয়েছে।

এবার কবি কৈলাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলছেন—কৈলাস হরপার্বতীর ক্রীড়াশৈল। তুমি যদি দেখ, মহাদেব তাঁর হাতের সর্পাভরণ খুলে গৌরীর সঙ্গে পাদচারণা করছেন, তখন তুমি ভক্তির ভঙ্গিতে নিজেকে সোপানের মতো স্থাপন করে তাঁদের ওপরে উঠতে সাহায্য কোরো, কিন্তু মনে রেখো, এসময়ে তোমার জলরাশি তোমার নিজের মধ্যে রুদ্ধ রাখতে হবে।—

''হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী॥''

মহাদেবের প্রতি শ্রদ্ধা অঞ্জলিভরে নিবেদিত হয়েছে এই শ্লোকে। মেঘদূতে মহাদেবের প্রতি এই শ্রদ্ধার আভাস পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়েছে কুমারসম্ভব কাব্যে। কুমারসম্ভবের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে দেবাদিদেব শিবকে কেন্দ্র করে।

কাব্যের শুরুতে আছে হিমালয়ের বর্ণনা, তারপর হিমালয়তনয়া পার্বতীর দৈবী সৌন্দর্যের বর্ণনা। পার্বতীই পূর্বজন্মের শিবজায়া সতী, যিনি জন্মান্তরে পরিচিত হয়েছেন হিমালয়-মেনকার কন্যারূপে। কবি বলছেন, শরৎকালে হংসমালা যেমন আপনি এসে উপস্থিত হয়, তেমনি মেধাবিনী পার্বতীর শিক্ষাকালে তাঁর পূর্বজন্মের বিদ্যাসংস্কার আপনাআপনি তাঁর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। একদিন দেবর্ষি নারদ পার্বতীকে দেখে বললেন, ইনি একদিন মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী হবেন। পর্বতরাজ জানেন নারদের বাক্য মিথ্যা হওয়ার নয়, কিন্তু দেবাদিদেব নিজে তো তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করেননি! যদি গিরিরাজের কন্যাদানের অভীপ্সা ব্যর্থ হয়, সেই আশঙ্কায় তিনিও মহাদেবকে কোনও অনুরোধ করলেন না। শুধু কন্যাকে আদেশ করলেন, হিমালয়ের সানুদেশে যেখানে শিব তপস্যা করছেন, পার্বতী সখীদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে যেন শিবের অর্চনা করেন।

কিন্তু শিব কি দেবেন সেই অনুমতি? এখানে কালিদাস অসাধারণ এক পঙ্‌ক্তি রচনা করলেন—

''প্রত্যার্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ
শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥''

—সমাধির প্রতিকূল হলেও শিব পার্বতীকে শুশ্রূষার অনুমতি দিলেন, কারণ বিকারের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাঁদের হৃদয় বিকৃত হয় না, তাঁরাই প্রকৃত ধীর। পার্বতীর উপস্থিতিতে আর কারও চিত্তবিকারের সম্ভাবনা থাকলেও মহাদেবের সে-ভয় নেই, কারণ তিনি নির্বিকার।

একদিকে যখন পার্বতী মহাদেবের অর্চনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অন্যদিকে তারকাসুরের উৎপীড়নে বিপর্যস্ত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এলেন প্রতিকারের উপায় চাইতে। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন,

''ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥''

—আমার কাছ থেকে বরলাভ করেছে যে-দৈত্য, আমার হাতে তার বিনাশ হতে পারে না। এমনকী বিষবৃক্ষকেও যদি কেউ বর্ধিত করে, তবু নিজের হাতে তা কেটে ফেলা অনুচিত।

এখন একটাই উপায়। মহাদেবের পুত্রই একমাত্র তাকে বধ করতে পারে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? শিব যে তপস্যারত, সমাধিমগ্ন। ব্রহ্মা বললেন—চেষ্টা করো তাঁকে উমার প্রতি আকৃষ্ট করতে। নির্বিকার, নির্বিকল্প শিবকে ধ্যানোত্থিত করা! ইন্দ্র উপায় খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ আটকে গেল কন্দর্পের উপর, কন্দর্পকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভের আশায় কন্দর্প নিজের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। বলতে বলতে আচমকা বলে ফেললেন—''তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধা।/ কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণে ধৈর্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে॥''—আমি বসন্তকে সহচর করে, আপনার অনুগ্রহে পিনাকপাণি শিবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারি। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন ইন্দ্র। বললেন—তোমাকে এই কাজেরই ভার নিতে হবে। বিভূতিভূষিত যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব যেন হিমালয়কন্যা পার্বতীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তোমাকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আজ দেবগণ তোমার কৃপাপ্রার্থী। ঋতুরাজ বসন্ত হবেন তোমার এই কাজের সহচর। কাজটিও ত্রিলোকের কল্যাণজনক।

কন্দর্প জানেন প্রাণের বিনিময়েও তাঁকে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। দেবরাজের আদেশ অমান্য করা তাঁর পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বললেন—তাই হোক। ইন্দ্র প্রসন্নচিত্তে কন্দর্পকে স্পর্শ করে উৎসাহিত করলেন। বসন্ত ও স্ত্রী রতিকে সঙ্গে নিয়ে কন্দর্প, হিমালয়ের যেখানে মহাদেব তপস্যা করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হল প্রেক্ষাপট। বসন্তকালে প্রকৃতি যেমন অপরূপা হয়ে ওঠে, মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বিগণ প্রকৃতির মধ্যে সেই সৌন্দর্য, পশুপাখির মধ্যে সেই চঞ্চলতা লক্ষ করলেন। লতাগৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে মহাদেবের অনুচর শাসনের ভঙ্গিতে তর্জনী ঠোঁটের ওপর রেখে বললেন—'মা চাপলায়েতি'—কোনওরকম চপলতা কোরো না। সঙ্গে সঙ্গে, ''নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃত-দ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।/ তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥'' সমস্ত বনভূমি নিষ্কম্পচিত্রের মতো স্থির হয়ে গেল। যেন সমস্ত প্রকৃতি ছবিতে আঁকা। কিন্তু কন্দর্পকে তো মহাদেবের কাছে পৌঁছতে হবে! সখা বসন্তের দৃষ্টি এড়িয়ে কন্দর্প এসে পৌঁছলেন মহাদেবের ধ্যানস্থলে। কী দেখলেন তিনি?

''স দেবদারুদ্রুম-বেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধান-বত্যাম্।'' দেবদারুতলে বেদির ওপরে ব্যাঘ্রচর্মে বসে ধ্যানস্থ মহাদেব। তাঁর শরীরে কোনও স্পন্দন নেই।

তাঁর জটাভার সাপ দিয়ে বাঁধা আছে, কানে রয়েছে রুদ্রাক্ষের অলংকার, যে-কৃষ্ণমৃগচর্ম তিনি পরিধান করে আছেন, তা তাঁর কণ্ঠের নীল রঙের জন্য আরও বেশি নীল দেখাচ্ছে (হলাহল পান করেছিলেন বলে মহাদেব নীলকণ্ঠ)।

তিনি তাঁর দেহস্থ বায়ুসমূহকে নিরুদ্ধ করে রেখেছিলেন বলে তাঁকে মনে হচ্ছিল বৃষ্টিহীন মেঘ কিংবা তরঙ্গহীন সমুদ্রের মতো। বায়ুহীন স্থানে প্রদীপ জ্বালালে যেমন শিখাটি জ্বলে কিন্তু এতটুকু কাঁপে না, মহাদেবকে দেখে কন্দর্পের সেরকমই মনে হল। এখানে অসাধারণ ব্যঞ্জনার সাহায্যে মহাদেবের ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির বর্ণনা দিলেন কালিদাস। ধীরে ধীরে কবির ব্যঞ্জনা কাব্যিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হচ্ছে। কন্দর্প দেখছেন, মহাদেব তাঁর ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বারগুলি নিরুদ্ধ করে, সমাধির দ্বারা বশীভূত মনকে হৃদয়ে স্থাপন করে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা যাঁকে অবিনাশী অক্ষর পুরুষ বলেন তাঁকেই নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর এই সমাধিস্থ অবস্থা দেখে কন্দর্পের হাত থেকে নিজের অজান্তেই ধনুর্বাণ খসে গেল, তাঁর নিজেরই তখন বাক্‌রুদ্ধ অবস্থা। এই সময়ে পার্বতী তাঁর দুই সখীকে নিয়ে শিবের পূজার জন্য প্রতিদিনের মতো সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মহাদেবও হৃদয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি—পরমাত্মার জ্যোতি দর্শন করে ধ্যান থেকে বিরত হলেন। নন্দী গিরিজার উপস্থিতির সংবাদ জানালে, মহাদেব তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। বসন্তকালীন অশোক, কর্ণিকার, সিন্ধুবারে সজ্জিতা পার্বতীকে দেখে মনে হচ্ছিল 'পল্লবিনী সঞ্চারিণী' লতার মতো। কন্দর্প এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ভাবলেন, তাঁর কার্যসিদ্ধি হলেও হতে পারে। পার্বতী ধ্যানগৃহে প্রবেশ করে নিজের হাতে চয়ন করা ফুল, পল্লব মহাদেবের চরণে নিবেদন করে প্রণাম করলেন। মহাদেব আশীর্বাদ করলেন—''অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি''—এমন পতি লাভ করো, যিনি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত নন। তাঁর এই আশীর্বাদ সফল হয়েছিল।

অন্যদিন পার্বতী পূজা করে চলে যান, মহাদেব ভ্রূক্ষেপও করেন না। কিন্তু কন্দর্পের উপস্থিতিতে ঘটনক্রম বদলে গেল। মহাদেব তাকালেন পার্বতীর দিকে, আর তারপরেই অনুভব করলেন চিত্তচাঞ্চল্য। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পেলেন কন্দর্পকে। তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাঁর ক্রোধ প্রদীপ্ত হল। সেই ক্রোধানল বহির্গত হল তৃতীয় নয়ন দিয়ে। দেবতারা কন্দর্পকে পাঠিয়েছিলেন নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য। আকাশ থেকে তাঁরা সমস্ত ঘটনাই লক্ষ করছিলেন। মহাদেবকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে তাঁরা আর্তনাদ করে উঠলেন। ''ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।/ তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥''—হে প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন—এই আর্তনাদ শিবের কানে পৌঁছনোর আগেই ভস্মীভূত হয়ে গেলেন কন্দর্প। তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ মদনকে ধ্বংস করে প্রমথদের নিয়ে মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। পিতা যে-কাজে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেই কাজ সুসম্পন্ন হল না বলে শূন্যমনে পার্বতী গৃহের অভিমুখে যাত্রা করলেন। কন্যার এই অবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না হিমালয়। ঐরাবত যেমন ছোট্ট পদ্মফুলকে দাঁতে তুলে নেয়, তেমনভাবে ছুটে গিয়ে নিমীলিতনয়না, অনুকম্পার পাত্রী পার্বতীকে কোলে তুলে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ি ফিরে এলেন। একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ব্যর্থমনোরথ পার্বতী অনুভব করলেন, একমাত্র তপস্যা দ্বারাই মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। পার্বতীর জননী তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন, তপস্যার কঠোরতা কি ওই সুকুমার দেহ বহন করতে পারবে? মায়ের উপদেশ পার্বতীকে তপস্যার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে

পারল না। সখীদের সঙ্গে নিয়ে পর্বতশিখরে গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন তিনি। পরবর্তী কালে ওই শিখর তাঁরই নামাঙ্কিত 'গৌরীশিখর' বলে পরিচিত হয়েছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য আর চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড করে পঞ্চতপা, অবিরত বৃষ্টিধারায় অনাবৃত শিলার ওপর শয়ন, পৌষ মাসের দুর্জয় শীতের রাত্রিতে আকণ্ঠ জলে বসে জপ—কী দুশ্চর তপস্যা! ঝরে পড়া পাতার রস পান করে জীবনধারণ করতেন, কিন্তু শেষে তাও ত্যাগ করে হয়ে উঠলেন 'অপর্ণা'। তপস্যার শেষ পর্বে এক জটাধারী ব্রহ্মচারী তপোবনে প্রবেশ করলেন। পরিধানে মৃগচর্ম, হাতে পলাশদণ্ড (উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্যের চিহ্নস্বরূপ পলাশের দণ্ড দেওয়া হয়), ব্রহ্মতেজে দীপ্ত, দেখে মনে হয় যেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্বয়ং মূর্তি পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছেন। উমা শাস্ত্রবিধি অনুসারে অতিথির সৎকার করলেন। এইবার তিনি পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা তোমার এই তপস্যা কীসের জন্য? পিতৃগৃহে তোমার মর্যাদাহানি হয়েছে, তা সম্ভব নয়, তোমাকে কেউ অপমান করবে, এত সাহস কারও হবে না। তুমি কি তবে স্বর্গের জন্য তপস্যা করছ? তাহলে সে-পরিশ্রম বৃথা, কারণ তোমার পিতৃগৃহই তো দেবভূমি। আর যদি পতির কামনায় এই সাধনা করে থাকো, তবে তোমার এই তপস্যার দরকার নেই। কারণ রত্ন নিজে কারও অন্বেষণ করে না, মানুষই তার সন্ধান করে নেয়। ভাববাচ্যে প্রশংসা করলেন পার্বতীর।

তারপর বললেন—তুমি যার জন্য তপস্যা করছ, সেই যুবার হৃদয় নিশ্চয়ই খুব কঠিন। এই যে তোমার পিঙ্গলবর্ণ জটা হয়ে গেছে, তা দেখেও সে তোমাকে উপেক্ষা করছে। এবার আমি তোমার বরের পরিচয় জানতে চাই।

ব্রহ্মচারীর এই প্রশ্নে পার্শ্ববর্তিনী সখীর দিকে তাকালেন উমা। উমার আশ্বাস পেয়ে সখী বললেন—মহেন্দ্র প্রমুখ দিক্‌পালদের অবমাননা করে যিনি কন্দর্পকে বিনাশ করে দেখিয়েছিলেন রূপের দ্বারা তাঁকে আকর্ষণ করা যাবে না, সেই পিনাকপাণি শিবকেই তিনি পতিরূপে পেতে ইচ্ছুক। একথা শুনে ব্রহ্মচারী এতটুকু আনন্দ প্রকাশ করলেন না, বরং বললেন—মহেশ্বরকে আমি জানি, তার সবকিছুই অদ্ভুত। শিবের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণ সবই অন্য দেবতাদের চেয়ে আলাদা। তার জন্মের কথা কিছুই জানা যায় না। শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না ব্রহ্মচারী। শিবের সঙ্গে পার্বতীর যে কোনওভাবেই বিবাহ হওয়া উচিত নয়, একটার পর একটা যুক্তি সাজিয়ে তা বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন—বিবাহ করতে হলে তোমাকে তার পাণিগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার হাতে যে সাপ কিলবিল করছে, তুমি কী করে তার পাণিগ্রহণ করবে? তার সারা শরীরে চিতাভস্ম লেপন করা থাকে। চিতাভস্ম তো অশুদ্ধ। চিতাভস্ম স্পর্শ করলে তোমায় যে স্নান করতে হবে! আমি তোমার সামনে আরও একটা বিড়ম্বনা দেখতে পাচ্ছি। তুমি গজরাজের বহনযোগ্য, বিবাহের পর যখন তুমি বুড়ো ষাঁড়ের পিঠে চড়ে যাবে, তখন তোমাকে দেখে সবাই উপহাস করবে। ব্রহ্মচারী বলেই চলেছেন; সবশেষে বললেন—এই অসৎ ইচ্ছা থেকে মনকে নিবৃত্ত করো। তোমার ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারছি না।

পার্বতীও আর পারছেন না। এবার তাঁকে উত্তর দিতেই হল। ক্রুদ্ধ হয়েছেন তিনি। সখীদের ওপর আর ভরসা না করে নিজেই মুখ খুললেন—এতক্ষণ ধরে আপনি যা যা বললেন, তাতে বুঝলাম আপনি শিব সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানেন না। মহাত্মাদের চরিত্র আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো হয় না। সেইজন্য অল্পবুদ্ধি মানুষেরা তাঁদের নিন্দা করে। চিতাভস্ম অশুদ্ধ, কিন্তু তাঁর অঙ্গস্পর্শ মাত্রই চিতাভস্ম বিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের

সময় সেই ভস্ম যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন দেবতারাও সেই ভস্ম নিয়ে কপালে মাখেন। শিব যখন বুড়ো ষাঁড়ে চড়ে পথে বের হন, তখন দেবরাজ ঐরাবতের পিঠ থেকে নেমে এসে তাঁর চরণে প্রণাম জানান। ইন্দ্রের মাথার মন্দার ফুলের পরাগে শিবের শুভ্রবর্ণ চরণ অরুণবর্ণ ধারণ করে। আপনি শিবের দোষকীর্তন করতে গিয়ে একটা কথা সত্য বলেছেন, যিনি স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মার উদ্ভবের কারণ, তাঁর জন্মবৃত্তান্ত কী করে জানা যাবে?

একটার পর একটা যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মচারীর যুক্তি খণ্ডন করার পর পার্বতী বললেন—আর বাদানুবাদে প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রতি অনুরাগে আমার মন স্থির। এরপরও পার্বতী যখন দেখলেন, ব্রহ্মচারী আরও কিছু বলতে যাচ্ছেন, তখন তিনি সখীকে বললেন—মহাপুরুষের নিন্দা যে করে সে-ই যে কেবল পাপী তা নয়, নিন্দা যে শোনে সে-ও পাপভাগী। আমিই বরং এখান থেকে চলে যাই।

এই বলে যে-মুহূর্তে পার্বতী চলতে শুরু করেছেন, সেই মুহূর্তে ব্রহ্মচারী নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর পার্বতীর শিব সাক্ষাৎকার হল। কালিদাস বলছেন, প্রবাহের পথে কোনও পর্বতে বাধা পেলে নদী যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে, সামনে বা পেছনে কোথাও যেতে পারে না, পার্বতীর অবস্থাও এখন সেরকম—

''তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।/ মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥''

—মহাদেবকে দেখে উমা কাঁপতে লাগলেন, তাঁর ক্ষীণতনু স্বেদসিক্ত হয়ে উঠল। চলে যাওয়ার জন্য যে-পদ তিনি ঊর্ধ্বে তুলেছিলেন তা ঊর্ধ্বেই রয়ে গেল। উমা অগ্রসরও হতে পারলেন না, পিছনেও যেতে পারলেন না—নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহাদেব বললেন—তুমি তোমার তপস্যার দ্বারা আমাকে কিনে নিয়েছ, আজ থেকে আমি তোমার দাস হলাম। এই কথায় পার্বতীর এতদিনের তপস্যার সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

এখানেই শুরু পরবর্তী অধ্যায়ের, যেখানে পার্বতী তাঁর সখীকে পাঠিয়ে শিবকে বলে পাঠালেন—গিরিরাজ আমার পিতা, তিনিই আমাকে দান করতে পারেন, আপনি তা প্রমাণ করুন।

মহাদেব বললেন—তাই হবে। তারপর তিনি সপ্তর্ষিদের স্মরণ করে, তাঁদের হিমালয়ের কাছে গিয়ে শিবের জন্য হিমালয়দুহিতার পাণি প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন। সপ্তর্ষি 'যথা আজ্ঞা' বলে প্রস্থান করে, উপস্থিত হলেন হিমালয়ের কাছে। তাঁকে বললেন, ''যাকে সকলেই স্তুতি করে অথচ তাঁর স্তবযোগ্য কেউ নেই, সেই জগদ্‌গুরু শংকরকে কন্যা দান করে আপনিও গুরুস্থানীয় হোন (কারণ শ্বশুরও গুরুস্থানীয়)। সমগ্র জগৎ আপনার কন্যাকে তখন মা বলে স্বীকার করবে, কারণ মহাদেব জগতের পিতা।

হিমালয় ঋষিদের আনীত বিবাহপ্রস্তাব স্বীকার করে, তিনদিন বাদে বিবাহের দিন স্থির করলেন।

শিব ও উমার বিবাহ উপলক্ষ্যে একইসঙ্গে হিমালয়ভবনে ও কৈলাসে তোড়জোড় শুরু হল। প্রত্যেকেই উপহার এনেছেন মহাদেবের জন্য। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দেবাদিদেব সেগুলি শুধুমাত্র স্পর্শ করলেন। কালিদাস বলেছেন, কোনও সাজসজ্জা বা আভূষণের প্রয়োজন হল না শংকরের। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী স্বাভাবিক বেশভূষাই রূপান্তরিত হয়ে অলংকারে পরিণত হল। ভস্ম হল শ্বেতবর্ণের অঙ্গরাগ, যে-সাপগুলি জড়ানো ছিল তাঁর হাতে কোনওটা হল মণিবন্ধ, কোনওটা বা বাহুবন্ধ। সাপের ফণায় যে-মণিগুলি ছিল, তাদের শোভা অপরিবর্তিত রইল। তাঁর এক অনুচরের স্বচ্ছ খড়্গে বরবেশী মহাদেব নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন। বৃষের পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি হিমালয়নগরে পৌঁছলেন।

হিমালয় নিজে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। ত্রিলোকপুজ্য শিব হিমালয়কে প্রণাম জানালেন। শিবকে প্রণত অবস্থায় দেখে গিরিরাজ স্বয়ং লজ্জিত হয়ে পড়লেন। শিবের মহিমাতে কখন যে তাঁর মাথা আপনাআপনিই নত হয়ে পড়েছে তা তিনি বুঝতেই পারেননি। বিবাহকার্য সম্পন্ন হল। জগতের মাতাপিতাস্বরূপ পার্বতী-পরমেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা পার্বতীকে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু মহাদেবকে কী বলে আশীর্বাদ করবেন ভেবে না পেয়ে নীরব রইলেন।

দেবী লক্ষ্মী তাঁদের মাথায় পদ্মের ছাতা ধরলেন, দেবী সরস্বতী এই দম্পতির স্তব করলেন। অপ্সরারা অভিনয় প্রদর্শন করলেন। তারপর দেবগণকে বিদায় দিয়ে গিরিরাজকন্যা উমাকে নিয়ে চন্দ্রশেখর বাসরঘরে এলেন। সেখানে ভূতনাথের ইঙ্গিতে প্রমথগণ এমন বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগল যে উমা হেসে উঠলেন।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু পাঠকের কাব্যরসাস্বাদনের রেশ থেকে যায় মনের গভীরে। কাব্যের ললিতকলার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এই কাব্যে। ঈশ্বরলাভের ক্ষেত্রে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে নিতান্ত তুচ্ছ, প্রথমে মদনভস্ম ও পরে উমার কঠোর তপস্যার নিবিড় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা প্রতিভাত হয়েছে। তাই এই কাব্য যুগে যুগে মানবের অন্তরে অপার্থিব আনন্দের অনুরণন তোলে; এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ করে দেয়।

শুধুমাত্র 'মেঘদূত' বা 'কুমারসম্ভব' নয়, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং 'মালতীমাধব' তিনটি নাটকই কবি শিববন্দনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। 'বিক্রমোর্বশীয়'তে লিখেছেন,

''বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো
নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ॥''

—যাঁকে বেদান্তে এক-পুরুষ বলা হয়েছে, যিনি স্বর্গ-মর্ত্য ব্যাপ্ত করে আছেন, ঈশ্বর শব্দটি যাঁর প্রতি যথার্থভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রাণাদি বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে মুমুক্ষুরা যাঁকে হৃদয়ে অন্বেষণ করেন, যিনি অচঞ্চল ভক্তিযোগে লভ্য, সেই মহেশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

এই বন্দনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে শিব কবির প্রিয় দেবতা। কিন্তু সেজন্য তাঁকে শৈব বলা ঠিক হবে না। কারণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে তিনি অভিন্নরূপেই দেখেছেন। তাঁর উদার কবিদৃষ্টি আমাদের পার্থিব জীবনযাত্রার প্রতিটি চর্যার মধ্যে অন্তর্নিহিত অপার্থিব ফল্গুধারাকে খুঁজে পায়। তিনি তাঁর হৃদয়ের ঈশ্বরকে সৃষ্টির মধ্যে খুঁজেছেন, ছুঁয়েছেন, বন্দনা করে তৃপ্তি লাভ করেছেন। তাঁর কবিসত্তা সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের পানে ধাবিত হয়েছে। পাঠক তাঁর কাব্য, নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছে চেনা জগতের পাশাপাশি অচেনা এক জগতকে। সাধনা দিয়ে, একাগ্রতা দিয়ে, অনন্যভক্তি দিয়ে সে-জগতের দ্বার খোলা যায়। আর সেই দ্বার একবার উন্মুক্ত হলে যে-অনন্ত আনন্দের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাস যেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই পথে অগ্রসর হয়ে যেদিন আমাদের ক্রমমুক্তি হবে, সেদিন আমরাও কবিগুরুর সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারব—

''ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে
***
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে,
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে
মিলে যাবে তালে।'' ✠